



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 462 - 467

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অন্নদাশঙ্করের ছড়ার জগৎ : মেয়েদের স্বতন্ত্র সত্তা- নির্মিতির আখ্যান

ড. শ্রীময়ী ব্যানার্জী

Email ID : sreemoyee18@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Abstract

Discussion

বাংলা সাহিত্যে ‘ছড়া’ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সংরূপ। ছড়ার প্রাথমিক পরিচিতি লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবে। পরে অবশ্য যখন সচেতনভাবে ছড়া লিখিত হতে শুরু করে, তখন থেকে তা অভিজাত সাহিত্যের অন্তর্গত হয়। তবে ছড়ার এই প্রচলিত পরিচিতির বাইরে তার অন্যতম পরিচিতি শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণি হিসেবে।

বাংলার প্রান্তিক জনজীবনে ছড়া বহুকাল ধরে প্রচলিত। তার উৎস, রচয়িতা, রচনাকাল প্রায় সবটাই অজানা, অনুমাননির্ভর। কিন্তু মৌখিক পরম্পরায় বাহিত এই ছড়াগুলি যেহেতু সামাজিক ও ঐতিহাসিক দলিল, সেহেতু উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে ছড়া সংগ্রহ ও সংকলনের বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায় পণ্ডিত মহলে। ছড়ার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণের উদ্যোগে একধরনের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার উন্মেষ ঘটে। এই সময়ের অন্যতম প্রধান ছড়া সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১ বঙ্গাব্দে লিখিত ‘লোকসাহিত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ প্রবন্ধ দুটিতে মোট ৮১টি ছড়ার উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিই আমাদের সর্বপ্রথম ভাবতে শেখান যে, বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছড়াগুলি শুধুই লোকসাহিত্য নয়, তার মূল আবেদন হৃদয়ের কাছে, শিশুমনের কাছে; অতএব, এগুলি নিঃসন্দেহে শিশুসাহিত্য।

লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য— ছড়ার এই দ্বন্দ্বিক অবস্থান বর্তমান আলোচনার উপজীব্য নয়। ছড়ায় মেয়েদের কথা কীভাবে বিধৃত হয়েছে, আমরা তা দেখতে চাইব এই প্রবন্ধে। তবে সীমিত পরিসরে ছড়ার পূর্ণ জগতে আলোকপাত করা অসম্ভব। তাই উক্ত প্রবন্ধে আমরা সন্ধান করব বাংলা ভাষার বিশেষ এক ছড়াকারের মৌলিক ছড়ার জগতে মেয়েদের অবস্থিতিকে।

মূল আলোচনা শুরু করার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। মৌখিক পরম্পরায় স্থানান্তরে এবং কালান্তরে বাহিত এই ছোটদের ছড়াগুলিতে মেয়েদের অবস্থান দুরকম— কথক হিসেবে ও চরিত্র হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন সেই চিরকালীন ‘স্নেহাঙ্গী সরল মধুর কণ্ঠ’-এর, যা থেকে এই ছড়াগুলি ধ্বনিত হ’ত। কখনো কখনো এই পল্লিরমণীরাই হতেন ছড়ার রচয়িতা। তিনি শিশুমন ও প্রাপ্তবয়স্কমন উভয়ক্ষেত্রেই ছড়ার এই চিরকালীন আবেদনটি গড়ে ওঠার পেছনে কথক ও কখনো রচয়িতা হিসেবে সরল পল্লিবালাদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি, এই কারণেই

ছড়াগুলি অভিহিত হয়েছে ‘মেয়েলি ছড়া’ হিসেবে; কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ছড়ায় মেয়েদের গুরুত্ব স্বীকারার্থে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াগুলিতে অনুভব করেছিলেন ‘ম্লিন্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন’ ‘সৌকুমার্য’— যাকে তিনি বলেছেন ‘বাল্যরস’;^১ এবং এ-ও বলেছিলেন যে, -

“ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে— শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।”^২

এই বক্তব্য নিশ্চিতরূপেই গ্রহণীয়, কিন্তু, যখনই এই ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ে, তখনই এমন কিছু অন্যরকম প্রসঙ্গ আসে, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল ছড়াতে চরিত্রের পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অসাম্য। শিশু মনোরঞ্জনই যে সংরূপের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে চরিত্র হিসেবে মেয়েদের একপ্রকার ব্রাত্য করেই রাখা হ’ল, যেন শিশু হিসেবেও তারা পুরুষ শিশুদের তুলনায় কিঞ্চিৎ পৃথক। আবার, যে সংরূপের চালিকা তথা বাহিকাশক্তি মহিলারা, সেই সংরূপে মেয়েরা চরিত্র হিসেবেও ছেলেদের সমান গুরুত্ব পেল না কেন, এ বেশ বিস্ময়কর— এগুলিই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই পাঠক তথা সমালোচকের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ‘ছেলেভুলানো ছড়া’র বক্তব্যকে ধারণ করে রেখেছে সামাজিক চাহিদা আর ‘সামূহিক নির্জ্ঞান’ (Collective consciousness) এবং তার ফলস্বরূপ ছড়াগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে শিশুপুত্র ও শিশুকন্যার বিপ্রতীপ অবস্থান (Binary)।

বাংলা ছড়া যখন মৌখিক পরম্পরায় বাহিত হত, তখন সেখানে মেয়েদের ‘অপর’ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা গেছে বারংবার। কিন্তু যখন থেকে সচেতনভাবে ছড়া লিখতে আরম্ভ করেছেন ছড়াকারেরা, তখন সেখানে সমাজ-সময়ের ঘেরাটোপ পেরিয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই মৌখিক ছড়ার ক্ষেত্র মৌলিক ছড়ায় এসে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত রূপরেখাই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য, যার মূল অবলম্বন অন্নদাশঙ্কর রায় বিরচিত ছোটদের ছড়া।

বাংলা ছড়ার জগতে অবিস্মরণীয় নাম অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯৩৭ সালে রাজশাহির জেলাশাসক অন্নদাশঙ্করের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফ থেকে একটি টেলিগ্রাম আসে নাটোরের যাত্রায় কবির সঙ্গী হওয়ার আর্জি জানিয়ে। অন্নদাশঙ্কর সেই যাত্রায় স্বয়ং মহাকবি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন ছড়া লেখার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথও তখন ছড়া লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর বিস্মিত হলে তিনি তাঁর ‘সে’ বইটি অন্নদাশঙ্করকে উপহার দেন। এই বইটির সূত্রেই অন্নদাশঙ্কর ছড়া লিখতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ১৯৪২ সালে বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে ‘একপয়সায় একটি’-তে পাঠিয়ে দেন ১৬টি ছড়া। পরে ঐ ছড়াগুলির সংকলন প্রকাশিত হয় ‘উড়কি ধানের মুড়কি’ নামে। এইটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছড়ার বই। আটপৌরে মৌখিক ভাষা ও চলতি ছন্দে ছড়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বলা বাহুল্য, ছড়ার সহজ কাঠামোয় কখনো লঘু, কখনো বা গুরুগম্ভীর বিষয়ের বিন্যাস অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলিতে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছিল।^৩

অন্নদাশঙ্করের ছোটদের জন্য লেখা ছড়ার বইয়ের সংখ্যা ৭টি ও বড়দের জন্য ছড়ার বই ৪টি। আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় ছোটদের বইগুলিকে নির্ভর করেই বিশ্লেষণ করব। আমরা এখানে দেখতে চাইব অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় মেয়েদের কথা কীভাবে উঠে এসেছে, কীভাবেই বা মেয়েদের অবস্থান মৌখিক ছড়ার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমাদের মূল বক্তব্য বিষয়কে কয়েকটি আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, প্রথমেই আসে অভিযান প্রসঙ্গ। ‘অভিযান’ বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ‘অ্যাডভেঞ্চার’ কাকে বলে? Collins Cobuild ‘Essential English Dictionary’-তে ‘Adventure’ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে—

“An adventure is a series of events that you become involved in that are unusual, exciting and rather dangerous.”^৪

সুতরাং, বাঁধা গতের বাইরে নতুন ধরনের উদ্দীপনামূলক কোনো কাজে বাঁপিয়ে পড়াই হল অ্যাডভেঞ্চার। এই কাজ কখনো কখনো বিপজ্জনকও বটে। বটে। ‘Encyclopedia of Adventure Fiction’ - এর ভূমিকায় সমালোচক [Don D'Amassa](#) বলেছেন -

“An adventure is an event or series of events that happens outside the course of the protagonist's ordinary life, usually accompanied by danger, often by physical action. Adventure stories almost always move quickly, and the pace of the plot is at least as important as characterization, setting and other elements of a creative work.”^৫

তবে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির বিপ্রতীপে এই ‘নেশা’র অবস্থান। তাই ‘অ্যাডভেঞ্চার’ একধরনের রোম্যান্টিকতার সূচক বা চিহ্নও বটে। মেয়েদের অভিযান বা অ্যাডভেঞ্চারের কোনো ধারণা লৌকিক ছেলেভুলানো ছড়ায় একেবারেই ছিল না। হয়তো সম্ভবও ছিল না। মেয়েদের গন্তব্য ছিল একমাত্র ‘শ্বশুরবাড়ি’। এমনকি, তার সমবয়সী ছেলেটি ‘ক্ষীর নদীর কূলে’ মাছ ধরতে গেলে সেই অভিযানের সঙ্গী হওয়ার অনুমতিও পেতে অভ্যস্ত ছিল না মেয়েরা। কিন্তু, অন্নদাশঙ্কর যখন ছড়া লিখতে শুরু করলেন, তখন সচেতন ভাবেই তিনি মেয়েদের করে তুললেন বহিমুখী।

প্রথমেই ‘রাঙা ধানের খই’ বইটির কয়েকটি ছড়া দেখে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই আসে ‘ইরা তারা’ নামের ছড়াটি। এখানে ইরা ও তারা অবশ্যই দুটি মেয়ে এবং এদের অভিযানের কাহিনি ছড়ায় ধরা পড়ে। মৌখিক ছড়ায় বালিকাকে যখন প্রস্তুত করা হয় ‘রাঙা মাথায় চিরুনি’ দিয়ে বরের আগমনের জন্য, তখন অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ইরাকে প্রস্তুত করেন ভিনদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য— “ইরা ইরা ইরাণী/ রাঙা মাথায় চিরুনি/ ইরা যাবে তেহারান/ ওরা ভেবে হয়রান।”^৬ একইভাবে বোখারা-অভিযানে ব্যস্ত হয় তারা— “তারা তারা তাতার/ ঘুম আসে না তার/ তারা যাবে বোখারা/ বোঝে নাকো বোকারা”। সুতরাং মেয়েদের অভিযান-প্রস্তুতি চলতেই থাকে ‘ওদের’ তথা পারিবারিক-সামাজিক অভিভাবকদের হয়রানিকে অবজ্ঞা করেই। অপরাপর দেশকে জানার যে অদম্য তৃষা অন্নদাশঙ্করের ছিল, এখানে হয়তো সেই ভাবনারই সরলীকৃত প্রকাশ ঘটেছে; আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি এই ভাবনায় সামিল করেছেন মেয়েদের স্বাধীন বিচরণকে। ‘শৈশব’ অবস্থার বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে চিহ্নিত করেছেন কবি। খুকুর জন্য কবি নামিয়ে আনতে চান ‘এরোপ্লেন’ বা ‘হেলিকপ্টার’ — মন ভোলানোর ধরণ বা উপকরণ পালটে যেতে শুরু করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

আলোচনার দ্বিতীয় আঙ্গিক বিবাহ প্রসঙ্গ। উনিশ শতকে মেয়েদের ‘শৈশব’ গড়ে না উঠতে পারার অন্যতম কারণ ছিল তাদের অতি দ্রুত বিবাহ-উপযোগী করে তোলার চাহিদা। ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে মেয়েদের ‘age of consent’ ছিল ১০। ১৮৯১ সালে তা হয় ১২, ১৯২৫ সালে ১৪ এবং ১৯৪০ সালে ১৬। ১৯২৯ সালে মেয়েদের বিবাহ সংক্রান্ত একটি যুগান্তকারী বিল পাশ হয়, যেখানে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় ১৪। এই বিল ইতিহাসে ‘সারদা বিল’ নামে বিখ্যাত। পরে অবশ্য এই বয়সসীমা বর্ধিত করে ১৮ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায় যে, বাংলার জনমানসে এই ভাবনাই প্রোথিত ছিল যে, মেয়ে জীবনের পূর্ণতা বিবাহে। তাই বারংবার মেয়েলি ছড়াগুলিতেও ফিরে ফিরে এসেছিল খুকিদের বিবাহ প্রসঙ্গ। মৌখিক ছড়ায় একপ্রকার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত, “অন্নপূর্ণা দুধের সর/কাল যাবি রে পরের ঘর”। ঘুমপাড়ানিয়া ছড়ায় বলা হয়, “দোল দোল দুলুনি/ রাঙা মাথায় চিরুনি/ বর আসবে এখুনি/ নিয়ে যাবে তখুনি”। ১৯৫৫ সালে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন ‘সুকুমারী’ নামক একটি ছড়া। এই ছড়াটি মৌখিক ছড়ার আদলে লিখিত হলেও তার অন্যরকম একটি পাঠ তৈরি করা যায়। সুকুমারীর বড় হওয়া ও বিবাহ-উদ্যোগ কবির কাছে মোটেও আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা নয়। বরং, তাঁর ‘সুকুমা’র ‘বড় হওয়া’ একপ্রকার ‘দায়’, কারণ তাহলেই বর এসে নিয়ে চলে যাবে! কন্যা কবির আদরের মানুষ বলে কবির পিতৃহৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পায় এই দুই পংক্তিতে— “সুকুমারী দুধের সর/ কেমনে করবি পরের ঘর?”^৭ সেখানে এই কবিতায় প্রকাশ পায় মেয়ের বিবাহ তথা ‘শ্বশুরবাড়ি’ নামক অপরিচিত স্থানে মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক কুণ্ঠা বা দ্বিধা। “এই মেয়েটা হলে বেটা/ একে নিয়ে যেত কেটা” — এ থেকে বোঝা যায়, সমাজের যাবতীয় অন্যায় আচরণ বা বিধি নিষেধের লক্ষ দীর্ঘসময় ধরে মেয়েরাই হয়ে এসেছে। ছড়াটির এই শেষ দুলাইনে সমাজের দিকে প্রশ্ন তুলেছেন অন্নদাশঙ্কর। তৈরি হয়েছে সমাজে বালক-বালিকার বিপ্রতীপ অবস্থান। আর একটি লৌকিক ছড়া এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, “ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝাম্ ঝাম্/ এ পারেতে লংকা গাছটি রাঙা টুকটুক করে।/ গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।।/ এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।/ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।।/ হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি/আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।”^৮ এই ধরণের ছড়াগুলিতে পুনরাবৃত্ত মোটিফ হিসেবে ধরা দিয়েছিল মেয়েদের সামূহিক করুণ পরিস্থিতি। এখানে, ভাই বোনের সুমধুর সম্পর্কের ঊর্ধ্বে যে

বিষয়টি ফিরে আসে, তা হল কোনো এক হতভাগিনীর দুর্বিষহ দিনযাপন-যন্ত্রণা। অন্নদাশঙ্কর কিন্তু তাঁর ছড়ায় সচেতনভাবেই এই হার্দিক সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সমাজের রক্তচক্ষুর উর্ধ্বে। ‘জন্মদিন’ পিতৃহৃদয়ের আবেগমথিত ছড়া। ছোট্ট মেয়ের জন্মদিনে বাবা মনে মনে ভাবেন, এই মেয়ে একদিন বড় হবে, ছোটটি থাকবে না। মেয়ের দীর্ঘজীবন কামনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও তাঁর মনে জাগে, যে, মেয়ে বড় হলেই ‘লক্ষ্মী’ হবে, দুষ্টমিও হারিয়ে যাবে—গত শতকেও যেখানে মেয়েকে ‘লক্ষ্মী’ ক’রে তোলাই ছিল একমাত্র পারিবারিক লক্ষ্য, কারণ তবেই তার গুণে ‘সংসার সুখের ক্ষেত্র’ হয়ে উঠবে, সেখানে পরবর্তী শতকের বাবা মেয়ের দস্যপনা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হয়ে উঠেছেন ব্যথিত। প্রকৃতপক্ষে দস্য মেয়ের লক্ষ্মী মেয়েতে প্রতিস্থাপন মানেই স্বাভাবিকতার নিরসনে মেয়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক অস্তিত্বের ভার। বাবা হয়তো তাই যন্ত্রণা বোধ করেন। মেয়ের সম্ভাব্য অস্তিত্ব-সংকটের আশঙ্কায় পিতৃহৃদয়ের এহেন গুরু বক্তব্য ছড়াসাহিত্যে বিরল।

তৃতীয় প্রসঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে সামাজিক অনুশাসনের দিকটি। সামাজিক লিপ্সিনির্মিতির কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। তার প্রক্ষেপ ছেলেভুলানো ছড়ায় স্পষ্টতই লক্ষণীয়। যেমন— “ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।/ বুনু বুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে,”^{১৪} আবার, “দিগ্নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।/ মোটা মোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে।/ চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে।/ গলায় তাদের তক্তমালা রক্ত ছুটেছে।/ পরণে তাদের ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে”^{১৫}, অথবা, “পুঁটু নাচে কোন্‌খানে।/ শতদলের মাঝখানে।/ সেখানে পুঁটু কী করে।/ চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে।/ ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে।”^{১৬} এই সবকটি ছবিতেই মেয়েদের পুকুর পাড়ে স্নানের বর্ণনা রয়েছে, যা ‘মেয়েলি কার্যকলাপের’ ইঙ্গিতবাহী। এর বেশি কিছু আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্র তাদের নেই। বরং উল্টোদিক দিয়ে বলা চলে, যে, সমাজ এই বিশেষ কাজের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেই কিছু শিশুকে ‘মেয়ে’ করে তুলতে অভ্যস্ত ছিল। অন্নদাশঙ্করের ‘ডালিম গাছের মৌ’ বইয়ের ‘ঘোড়দৌড়’ ছড়াটি তিনটি বালিকা— খুকু, আঁখি ও মুনিয়ার ঘোড়া ছোটাবার গল্প বলে। মোড়া, তাকিয়া বা দাদুর ভুঁড়ি— ওদের কল্পনায় সবসময় পরিণত হয় ঘোড়ায়। এখানে মেয়েদের কল্পনার বিস্তার শুধু দেখানো হয় তা-ই নয়, সমাজ-নির্দিষ্ট মেয়েসুলভ খেলা বা ‘মেয়েলি কাজ’ থেকে মেয়েদের বিরত করে ছেলেদের সঙ্গে associated ঘোড়দৌড়কে মেয়েদের identity’র সঙ্গে যুক্ত করা হল। কবি এখানে প্রচলিত ধারণার বিপরীত উদাহরণ স্থাপন করে এক লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৈশব নির্মাণ করলেন। এর পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে, মেয়েদের রান্না বিষয়ক একটি ছড়া। মেয়েরা হবে ‘রন্ধনে দ্রৌপদী’—অন্তত সামাজিক চাহিদা তেমনটাই। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় ঘটে উলট-পুরাণ। ‘আহা কী রান্না’^{১৭} ছড়ায় এমন একটি মেয়ের কথা বলা হয়, যার রান্নায় সর্বদাই ঘটে লবণাধিক্য এবং এমন এক ‘বৌমা’র কথা বলা হয়, যার রান্নায় পাওয়া যায় শুধুই চিনির স্বাদ। কিন্তু এই দোষ কবি ঢেকে দেন কাব্যিক তর্জমায়। তিনি এদের নতুন নামকরণ করেন যথাক্রমে ‘লাবণী’ ও ‘মৌমা’। মেয়েদের দোষত্রুটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে শেখান কবি এই ছোট্ট ছড়ার মধ্যে দিয়ে।

ছেলে হোক বা মেয়ে, আদিকাল থেকে ছড়ার জগৎ এই বিষয়ে বেশ উদাসীন। অন্নদাশঙ্কর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর ছড়ায় মেয়েদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। যেমন, - ‘পড়ার ছড়া’র কেন্দ্রীয় চরিত্র মঞ্জুরিণী বকুল দে সারাদিনই পড়ে। কবি ‘পড়া’ নামক ক্রিয়াপদটি নিয়ে বেশ মজা করেছেন, বিভিন্ন ধরনের ‘পড়া’র পর শেষে গিয়ে বলেছেন এই পড়ায় ব্যথা বা হাত-পা ভাঙার ভয় নেই, কারণ, “এ পড়া/ গাছ থেকে নয়, ছাদ থেকে নয়/ লাইব্রেরি থেকে/ বই চেয়ে নিয়ে পড়া।”^{১৮} পাঠকের বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, অবশেষে তাহলে মেয়েদের স্ত্রী-নির্মাণ-প্রকল্পের পরিবর্তে মেয়েদের পড়াশুনো ছড়ার বিষয় হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ছড়ায় স্পষ্ট বলা হয়, “উঠতে বসতে চলতে চলতে/ পড়া!/ খেতে খেতে নাইতে নাইতে/ পড়া!/ নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে/ পড়া!/ চৌপর দিন, আবার সাঁঝে/ পড়া!/ রাত দুপুরে তিনটে বাজে/ পড়া!” মেয়েদের নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলির পরিবর্তন -গৃহকর্ম থেকে পড়াশুনো- নিঃসন্দেহে সমাজ-বদলের সূচক। আধুনিক ছড়া এভাবে সমকালকে উপস্থাপন করেছে। আবার, ‘সাত ভাই চম্পা’ নামক কবিতার বইয়ের ‘সবুরে মেওয়া ফলে’ ছড়াটিতে একটি মেয়ের লেখাপড়ার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কবি দেখিয়ে দিয়েছেন একটি বালিকার উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করে তাকে আট বছরের মধ্যে মাধ্যমিক, বা পনেরো বছরে স্নাতকোত্তর বা কুড়ি বছরে ডাক্তারি পড়তে বাধ্য করা হলে মেয়েটি ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হবে এবং পরিবারের আশানুরূপ ফল করতে না পারার কারণে সমাজের চোখে

সে ‘অধম’ বলেই চিহ্নিত হবে। তাই তিনি উপায় হিসেবে নির্দেশ/পরামর্শ দেন যে, “কচি মেয়ে ওর বয়সে খেলাধুলাই সাজে/ পড়াতে কি মন বসতে চায়/ ছেলেবেলা হারিয়ে গেলে যতই তাকে ডাকো/ আসবে নাকো আর সে পুনরায়।”^{১৪} আমরা লক্ষ করব, এই ছড়াতে শুধুমাত্র একটি মেয়ের লেখাপড়ার গল্প নেই— এখানে ধরা পড়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চিত্র। মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল আট বছরে বালিকার বিবাহ তথা ‘গৌরীদান প্রথা’। ‘কচি মেয়ের’ ‘ছেলেবেলা’ হারিয়ে যেত সেই দিনেই। লেখক তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার অতিরিক্ত ভার ও অভিভাবকের অতিরিক্ত প্রত্যাশায় কোনো এক মেয়ের অথবা সেই সময়ের হাজার হাজার মেয়ের শৈশব হারিয়ে যেতে দেখে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। অন্নদাশঙ্করের সময়ে মেয়েদের শিক্ষা সুপ্রচলিত। তাই ছড়াটির ভরকেন্দ্র শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে হয়ে উঠেছে মেয়েদের শৈশব-হত্যা-পরিকল্পনা। সমাজ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ বিষয়ে পরিবার বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি—অবলম্বনটুকু বদলেছে শুধু। তাই ছড়ার শেষ স্তবকে কবি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, “বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমার সেও একটি মেওয়া/ সবুর কর, ফলবে সুনিশ্চয়”। মেয়েকে নিজগুণে সমাদৃত করে রাখাটাই কাম্য— সংবেদনশীল কবি এভাবেই দেখতে চেয়েছেন এক বালিকা বা কিশোরীকে।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা দুটি একেবারেই অনাস্বাদিতপূর্ব ছড়ার উল্লেখ করতে চাইব। চড়া দুটি এ কারণেই আলোচ্য, কারণ দুটি ছড়াতেই দুটি অসমবয়সী বন্ধুত্বের গল্প বলা হয়েছে। ‘আতা গাছে তোতা’ বই এর ‘মন কেমন করে’ ছড়াতে ছোট্ট নাতনি মুনমুনি তার দিদুর বাড়ি ফেরার প্রত্যাশায় দিন গোনে; আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তার ব্যাকুল মন— এমনকি, স্বপ্নে সে সান্নিধ্য খোঁজে দিদুর। দিদা ও নাতনীর এরকম রোমান্টিক আখ্যান আগে কখনোই রচিত হয়নি, যদিও বহু সময়ে দিদিমারাই ছিলেন ছড়াকার ও নাতনীর। ছড়া ছড়ার উদ্ভিষ্ট শ্রোতা! দ্বিতীয় ছড়াটি বহুশ্রুত। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ তথা বাংলা ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র ক্ষোভ লঘু চালে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ‘রাঙা ধানের খই’ কাব্যগ্রন্থের অতি বিখ্যাত ছড়া ‘খুকু ও খোকা’ তে— “তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো/ তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ বাংলা ভেঙে ভাগ করো/ তার বেলা?”। একই ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর ‘সাত ভাই চম্পা’ বইয়ের ‘দাদু ও নাতনি’ নামক ছড়ায়। নাতনি তার দাদুকে জিজ্ঞেস করে, “তোমরা তখন করছিলে কি/ভাঙলো যখন বঙ্গ?”^{১৫} নাতনির কাছে এই বিষয়টি ধরা পড়েছে ‘রঙ্গ’ হিসেবে। দাদুর অকপট স্বীকারোক্তি, “দিদি, আমরা তখন করতেছিলাম/ ভায়ে ভায়ে দঙ্গ...লীগ বলেছে, কাটতে হবে,/ নইলে হবে জঙ্গ”। অন্নদাশঙ্কর কল্পিত ‘নাতনি’ বেশ সচেতন। তাই সে যেসব প্রশ্ন তোলে, তা রাজনৈতিক। ‘রাজা’, তথা ইংরেজ সরকারের অবস্থিতিতেই কীকরে দুটি ভিন্ন দলে যুদ্ধ বা ‘জঙ্গ’ হতে পারে, এ প্রশ্ন জাগে তার মনে। আবার দাদু সরলীকৃত করে বলেন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি— “দুই শরিকের খাঁই মেটাতে/ রাজা হল ভঙ্গ”। শেষ স্তবকে দাদুর বক্তব্যে উঠে আসে রাজনৈতিক সত্য— “দিদি, স্বপ্ন ছিল আমরা পাব/ সিঁধু থেকে গঙ্গ/ সিঁধু গেছে গঙ্গ আছে/ স্বপ্ন হল ভঙ্গ”। স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্নের মধ্যে যে দূস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশকে, তার স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে দাদু-নাতনির কথোপকথনে। এরকম সচেতন রাজনৈতিক কথাবার্তা ছোটদের ছড়ায় বিশেষ দেখা যায় না।

অন্নদাশঙ্করের ছোটদের ছড়ার জগৎ প্রসঙ্গে সমালোচক প্রণব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, -

“ছোটদের ছড়ায় অনাবিল মজা-আনন্দ এবং অবাস্তবতার আড়ালে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এবং সমাজ-সংস্কারের অনেক অন্যা-অসামঞ্জস্য সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মায়... শিশুদের ছড়ার ক্ষেত্রেও শুধু অবাস্তবতা আজগুবি ও অসম্ভাব্যতার ছোট কিছুকে শব্দ ও ছন্দের মজায় অনেক বড় করে দেখানোর চেষ্টা নেই। বরং ছোটদের মধ্যে স্বপ্নময়তা এবং কিছু পরিমাণ রহস্যময়তার রসসৃষ্টির প্রয়াস আছে।”^{১৬}

এই সমস্ত কারণেই অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলিতে মেয়েদের পৃথক পরিচিতি তৈরি হয়েছে। মেয়েদের শৈশব-কৈশোর চিত্রণের ক্ষেত্রেও তিনি প্রচলিত পথের বাইরে হেঁটেছেন। তাই তার সম্পর্কে এই উক্তিটি— “প্রবন্ধকার কথাসাহিত্যিক ভ্রমণ সাহিত্যকার কবি সমাজভাবুক কবি সব অন্নদাশঙ্করকে ছাপিয়ে ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করবেন”^{১৭} — নিঃসন্দেহে যথাযথ।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “ছেলেভুলানো ছড়া”, ‘লোকসাহিত্য’, রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয়খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮৯
২. তদেব, পৃ. ৬৯০
৩. ভদ্র, কালিদাস, সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গ অন্নদাশঙ্কর’, কলকাতা, রেসনন্স, ২০০০, পৃ. ৩১
৪. Collins Cobuild, Essential English Dictionary, London, William Collins Sons & Co Ltd, 1988, p. 16
৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_fiction on 13.05.2025, at 10.56 am
৬. রায়, অন্নদাশঙ্কর, রায়, ‘ছড়া সমগ্র’, কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৩, পৃ. ৪১
৭. তদেব, পৃ. ৭২
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, “ছেলেভুলানো ছড়া”, ‘লোকসাহিত্য’, রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয়খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮১
৯. তদেব, পৃ. ৬৭১
১০. তদেব, পৃ. ৬৭৩
১১. তদেব, পৃ. ৬৭৬
১২. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ‘ছড়া সমগ্র’, কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৩, পৃ. ১৩৪
১৩. তদেব, পৃ. ৭০
১৪. তদেব, পৃ. ১৯০
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৮-১৭৯
১৬. চট্টোপাধ্যায়, প্রণব, “ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর”, কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গ অন্নদাশঙ্কর’, কলকাতা, রেসনন্স, ২০০০, পৃ. ১৬৫
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৭

Bibliography:

- সোহিনী সিনহা, ‘চাকুরীজীবী বাঙালিনী : প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক’, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫
- ভারতী রায় সংকলন ও সম্পাদনা, “নারী ও পরিবার”, কলকাতা, আনন্দ, ২০০২